টিপাইমুখ বাঁধ এবং কিছু কথা

নার্গিস আক্তার বানু

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সেই গংগার ফারাক্কা বাঁধের কথা শুনে এসেছি। শুনেছি, ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের ন্যায্য পানি প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে ভারতের সাথে শুধুমাত্র মুজিব, জিয়া এবং এরশাদ সরকার মোট ৭৭টি উচ্চ পর্যায়ের মিটিং করেছেন। আর এতে ব্যয় হয়েছে ৮২ লাখের বেশী টাকা। কিন্তু একে একে সব সরকারই পানির সুসম বন্টন নিয়ে ভারতের সাথে সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ নদী পদ্মা ও মেঘনায় পানির অভাবে চর দেখা দিয়েছে, রুপসা ও ভৈরব নদীর মাটি হয়েছে লবনাক্ত - কৃষি, শিল্প, বন, মৎস্য এবং সর্বোপরি পরিবেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে তা আর নূতন করে উল্লেখ করতে চাই না। আজ যে বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, সেটি হলো আরও একটি সর্বনাশী বাঁধ নির্মাণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে যা বাংলাদেশের মানুষ ও পরিবেশের জন্য মরণ ফাঁদ হিসেবে গন্য হতে চলেছে। আর আমরা তার কতটুকু খবর রেখেছি।

ভারতের মিজোরাম ও মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীর টিপাইমুখে আমাদের সিলেটের জাকিগন্জ থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দুরে ১৬২ মিটার উচু ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত ক্ষমতা সম্পন্ন হাইড্রো-ইলেকট্রিক বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে যার নির্মাণ কাজ ২০১২ সালে শেষ হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এই বাধঁ নির্মাণের পেছনে আরো একটি উদ্দেশ্য হলো আশে পাশের এলাকাকে সেচের আওতায় এনে ফসলী জমির পরিমান বাড়ানো। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বাধ তৈরির কাজ ২০০৭ সালে শুরু হলেও সে এলাকার অর্থনৈতিক ও চরম পারিবেশিক দূষনের সম্ভাবনায় ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীরা প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পরে। এদিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলও বাঁধ নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখের জন্য চাপ প্রয়োগের করে, ফলে ভারত সরকার এই বাঁধের কাজ স্থগিত করতে বাধ্য হয়। সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর মাধ্যমে টিপাইমুখ দিয়ে বর্তমানে প্রায় ২০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এই বাঁধ নির্মাণ হলে মাত্র ১০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি (পলিবাহিত) বাংলাদেশে আসবে। ফলে এই নদীগুলো দু-তিন বছরের মধ্যে ভরাট হয়ে যাবে। নদীগুলো ভরাট হলে ঘন ঘন বন্যা কবলিত হবে। আর বছরের প্রায় ছয়-সাত মাস নদীগুলো শুকনো থাকবে। ফলে ঐ এলাকার এই দুই নদীর আশে-পাশে কৃষি, সেচ এবং খাবার পানির চরম অভাব দেখা দিবে। পরিবর্তন হবে জলবায়ুর অর্থাৎ অত্র এলাকার শিতল পরিবেশ গরম হতে থাকবে, মারাত্বক প্রভাব ফেলবে সিলেটের হাওরের পশুপাখি, সেখানকার সারকারখানা, গ্যাস শিল্প ইত্যাদির উপর। সুরমা-কুশিয়ারা নদী দুটি মেঘনা নদীর প্রবাহের সাথে মিলিত। ফলে মেঘনা নদীতে এর প্রভাব পরবে যা পক্ষান্তরে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এগুলো ছাড়াও আরেকটি মারাত্বক বিষয় হলো, টিপাইমুখের বাঁধ থাকবে ভারতের নিয়ন্ত্রনাধীন, ফলে প্রয়োজনে তারা বাঁধ বন্ধ রাখতে পারবে আবার অতিরিক্ত পানির প্রবাহ প্রয়োজনে ছেড়ে দিতে পারবে। আর বাংলাদেশের অবস্থান যেহেতু নিম্নমুখী, তাই সমস্ত প্রভাব পরবে আমাদের দেশে, পানি দিয়ে তলিয়ে যাবে। সবচেয়ে বেশী ভয়ের ব্যাপার হলো - যে বাধ নির্মাণ হচ্ছে তা যদি সঠিক ডিজাইন (বন্যা লেভেল) অনুসরন করে করা না হয় - সেই বাঁধ কোন কারনে ভেংগে গেলে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ এলাকা রাতারাতি পানি দিয়ে তলিয়ে যাবে। টিপাইমুখের বাধের ডিজাইন, ড্রয়িংস্, ম্যাপ ও এন্ভাইরনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যসেস্মেন্ট (ই আই এ) রিপোর্ট দেখার জন্য বাংলাদেশ ভারতের কাছে বহুবার অনুরোধ সত্যেও ভারত তা দেখাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে পানি প্রবাহের মুখে ইতিপূর্বে যে ৫০০টি বাধ নির্মাণ করা হয়েছে এর ৩৫০টি নির্মাণ করেছে ভারত। বাংলাদেশ এবং ভারত মোট ৫৩টি নদীর পানি শেয়ার করে। ভারতের এই পানি বন্টন নীতি চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটি বিরাট অঞ্চল বিশেষ করে সিলেট, নেত্রকোনা, কুমিল্লা জেলা মরুভুমিতে পরিণত হবে। আমাদের বুঝতে হবে - প্রকৃতির উপর একক আধিপত্য দেখানোর অধিকার কোন দেশের নেই। তাইতো আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে সময়ের সাথে সাথে বহু দেশ কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

আর্ন্তজাতিক নদী আইন অনুযায়ী এক দেশ অন্য দেশের পানি প্রবাহের বাঁধা দিতে বা পানি প্রবাহের ক্ষতি হবে এমন কোন প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করতে পারে না। তা সত্বেও ভারত আর্ন্তজাতিক নদী আইনকে লংঘন করে বাঁধ নির্মান করে চলেছে। ফলে পানি পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে আসছে। আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী পানি ব্যাবহার করা হলে আমাদের দেশের পানির ভাগ্যের উন্নয়ন সম্ভব। আর এই আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য আমাদেরকেই পথ খুজে রেব করতে হবে। ভারত তালপট্টি ইস্যুকে কেন্দ্র করে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু পানি বন্টনের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা নেয়ার ব্যাপারে নিশ্চুপ। একসময় বাংলাদেশ জাতিসংঘের পানি সনদে স্বাক্ষর করেছিল; কিন্তু ভারতের কারনে পরবর্তীতে তা আবার প্রত্যাহার করতে হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে পানি সমস্যা বিষয়ে জাতিসংঘ বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিতে চায় না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনে আমাদের আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ধরনা দিতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ, আর্ন্তজাতিক আদালতসহ বিশ্ব জনমতকে ভারতের এই একতরফা পানি নীতি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাথর্কে সামনে রেখে সবকটি রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং দেশপ্রেমিক শক্তিকে এ ব্যাপারে সোচ্চার ভুমিকা নিতে হবে। আমাদের দেশের কোটি মানুষের জীবন ও পরিবেশ বাঁচাতে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেস্টার কোন বিকল্প নেই।

ড নার্গিস আক্তার বানু অষ্ট্রেলিয়ায় একটি সরকারী করপোরেশনে পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত।